বীরভূমের পটুয়া, পটশিল্প ও পটসংগীত : একটি সমীক্ষা

সেখ একরামুল হোসেন

ইংরেজি 'Folklore' বা লোকসংস্কৃতি কথাটি এসেছে 'Folk' ও 'Lore' এই শব্দ দুটি থেকে। 'Folk' শব্দের অর্থ 'লোক'। 'লোক' বলতে বোঝায় 'Group of people'। অর্থাৎ যে একদল মানুষ নির্দিষ্ট অঞ্চলে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করেন, যাদের বৃত্তি বা পেশা, উৎসব-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ—একইরকম বা গভীর সাদৃশ্য আছে তারাই হচ্ছেন 'লোক' আর 'Lore' শব্দের অর্থ 'সংস্কৃতি'। সংস্কৃতি শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এককথায় এর সংজ্ঞা-স্বরূপ নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ। তবুও বলা চলে 'সংস্কৃতি' হলো 'সংস্কার বা ক্রিয়া' অর্থাৎ সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, চিত্রকলায়, ভাষায়, ভাস্কর্যে যেখানেই মানবচেতনা সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে তাই মূলত সংস্কৃতি। এককথায়, লোক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত যে সংস্কৃতি, যা তাদের সামগ্রিক জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে সম্পৃক্ত তাই হলো লোকসংস্কৃতি।

এই লোকসংস্কৃতির নানান ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিক লক্ষ করা যায়। এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো—বিভিন্ন ব্রত, আলপনা, বিবাহাদি অনুষ্ঠান রীতি, কৃষি-শিল্পকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান, চিত্রশিল্প প্রভৃতি। পটশিল্প এর অন্যতম এক নিদর্শন। পটশিল্প বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম এক অঙ্গ তথা বিশেষ এক প্রকারের লোকশিল্প। এই পেশার সঙ্গে যারা নিযুক্ত তারা 'পটুয়া' নামে পরিচিত।

আবহমান কাল ধরে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু শিল্পমনস্ক মানুষজন তাদের নিজস্ব ভাবধারা, সৌন্দর্য, অভিরুচির মাধ্যমে নিজেদের শিল্পের জগৎকে গড়ে তুলেছিলেন এবং তার প্রসার ঘটিয়েছিলেন বিভিন্ন জায়গায়। নাম না জানা সেই সকল মানুষদের লৌকিক আধার, উপকরণ ও বিষয়গুলি নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাদের শিল্পজগৎ। বাংলার পটুয়ারা এই শিল্পজগতেরই বাসিন্দা। এই পটুয়ারা কোথাও 'পোটো' আবার কোথাও 'পটচিত্রকর' নামেও সমধিক পরিচিত। 'পটুয়া' শব্দটি এসেছে মূলত 'পট্টিকার > পটকার > পটুয়া' এভাবে। পটুয়া সম্প্রদায়গণ জীবন-জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন লৌকিক বা পৌরাণিক ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে নিজস্ব ভাব-ভাষা ও সৌকর্যে পটের ভূমি প্রস্তুত করে তার উপর চিত্র অঙ্কন করে গীতের আকারে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে গিয়ে চিত্রসহযোগে পটসংগীতগুলি পরিবেশন করে থাকে। এভাবেই এই শিল্পকে কাজে লাগিয়ে পটুয়ারা তাদের রোজগার পথে নিয়োজিত হয়।

যার ভিত্তিতে এই পটুয়া সম্প্রদায়গণ গড়ে উঠেছিলেন সেই পট সম্পর্কে আলোকপাত

করলে দেখতে পাই, 'পট' এই শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'পট্ট' শব্দ থেকে। যার অর্থ কাপড় বা বস্ত্র। লেখা বা ছবি আঁকার কাজে ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ডকে পট বলা হয়। পটশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল বহু প্রাচীনকালে। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুরাণ, জীবনীকাব্য এমনকি মঙ্গলকাব্যেও এর সন্ধান মেলে। এছাড়াও পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'কংসবধ' পালায় এবং পাণিনীর 'অষ্টাধ্যায়ী'তে উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে, বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'-এ, ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'-এ এই পটুয়াদের জনপ্রিয়তা ও গুপ্তচরবৃত্তির কথা জানতে পারা যায়। পটুয়া বা চিত্রকরবৃত্তি ছিল এক প্রাচীন বৃত্তি। পুরাকালে শাস্ত্রের বিধান মেনে শুভ্র পট্টবস্ত্র বা কাপড়ের উপর পটুয়ারা ছবি আঁকতেন। মূলত সমাজের নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়গণ এই পেশার সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন। অনেকক্ষেত্রেই পটশিল্পের প্রধান বিষয় রূপে মান্যতা পেত দেব-দেবীর নানা মাহাত্ম্যজ্ঞাপক চিত্র। তবে পটশিল্পের বিষয়রূপে দেবদেবীর চিত্র থাকলেও এই শিল্প লোকজশিল্প রূপেই খ্যাত।

পটশিল্পের নানা বিভাগ লক্ষিত হয়। আকৃতি ও বিষয়শৈলী অনুসারে পটের বিভিন্নতা দেখা যায়। আকৃতি অনুসারে পট মূলত দুই প্রকার। যথা—১. জড়ানো পট বা দীঘল পট ২. চৌকো পট। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানতে পারি, জড়ানো বা দীঘল পটগুলি লম্বায় ১৫০-২০০ সেমি এবং প্রস্থে ২৫-৩০ সেমি হয়ে থাকে। চৌকোপট বর্গাকার বা আয়তাকারের হয়ে থাকে। অন্যদিকে বিষয়শৈলী অনুসারে পট চার প্রকার হয়ে থাকে। যথা—

১. **যমপট :** এই পটের মাধ্যমে পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি বিষয়কে চিত্রের আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়।
২. **গাজিপট :** মুসলিমধর্মের বীর যোদ্ধা ও গাজি বা পিরদের বীরত্ব ও তাঁদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শিত হয়।
৩. **অবতার পট :** বিভিন্ন পুরাণ, মহাকাব্য ও মঙ্গলকাব্যের মহান চরিত্রবিষয়ক যে সকল পট তা প্রদর্শিত হয়।
৪. **আদিবাসী পট :** সাঁওতাল আদিবাসীদের জন্মবৃত্তান্ত, তাদের জীবনযাত্রা প্রভৃতি বিষয় এই পটে চিত্রের আকারে তুলে ধরা হয়।

অঞ্চলবিশেষে পটের নানা বিভাগ ও ধরন লক্ষিত হয়। যেমন—কালীঘাটের পট, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের পট, মেদিনীপুরের পট। এরই অন্যতম পটশিল্প হিসেবে পরিচিত বীরভূম জেলার পটশিল্প। এই জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত অন্যতম একটি গ্রাম হলো দাঁড়কা। এই গ্রামের পটশিল্পকে আজও সমুজ্জ্বল করে রেখেছেন এখানকার পটশিল্পী হয়রান পটুয়া মহাশয়। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি, তিনি মূলত জীবন ও জীবিকার নিরিখে এই পটকে

কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে পটচিত্রভিত্তিক পটসংগীত গেয়ে থাকেন। তবে এর গুরুত্ব ক্রমশ ক্ষীণ হওয়ার জন্য এই শিল্পের পাশাপাশি তিনি চুড়ি আদি মনোহারির ব্যবসা করে গ্রামান্তরে ফেরি করে বেড়ান। তাঁর শিক্ষাগুরু ডালু পটুয়া মহাশয়। তিনি মূলত দীর্ঘ (২০-২২) বছর ধরে এই পেশার সঙ্গে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। তিনি নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ। কষ্টের মধ্যে দিয়ে পটসংগীত দেখিয়ে সংসার নির্বাহ করেন। বর্তমানে পটসংগীতের অবস্থান বিলুপ্তির পথে। যান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসনে পটসংগীত-এর আকর্ষণ তেমন নেই বললেই চলে। এই পটুয়ারা মূলত সমাজে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত। সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত।

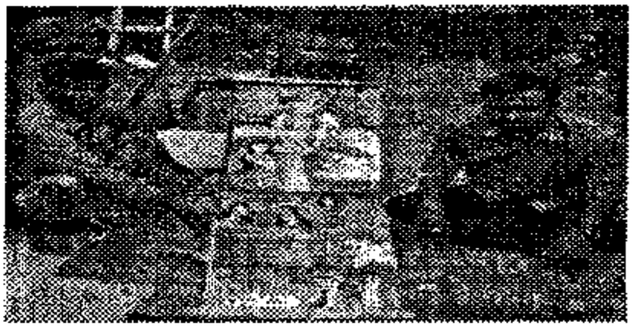

তাঁর কাছ থেকে পট সম্পর্কে যে তথ্য আমরা জানতে পেরেছি সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মূলত এই নিবন্ধে। তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন আঙ্গিক ও বিষয় শৈলীগত পটের কথা জানতে পারি। যেমন—

১. **যমপট :** মৃত্যুর দেবতা যমরাজকে কেন্দ্র করে মানুষের দৈনিক আচার-আচরণ ও পাপ-পুণ্যের দিকগুলি বিবেচনা করে লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্য পটচিত্র দেখিয়ে সংগীতের মাধ্যমে এই পট পরিবেশিত হয়। এই পটে চিত্রের আকারে বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়।

২. **অবতার পট :** বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবী, পুরাণ ও মহাকাব্যের চরিত্রগুলিকে অবলম্বন করে এই পটগুলি পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো—নিমাই সন্ন্যাসী, সাবিত্রী-সত্যবান, বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর ও রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে সিন্ধুমুনি পুত্র বধ ইত্যাদি। এই ধরনের পটগুলি জনসমক্ষে খুবই আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

৩. **গোরুর পট :** হিন্দু সমাজে গোরুকে দেবতা রূপে মান্য করা হয় এবং তার পুজো করা হয়। এই বিষয়টিকে অবলম্বন করে গোরক্ষণাবেক্ষণ ও তার প্রতিপালনকে উপজীব্য করে গোরুর পট রচিত হয়ে থাকে।

৪. **সমসাময়িক বিষয় সংক্রান্ত পট :** বর্তমান সময় ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি দিকগুলি তুলে ধরা হয়। এই পটগুলিতে মূলত ঘরজামাই হয়ে থাকার বিড়ম্বনা, তাদের কষ্ট-যন্ত্রণার কথা, মা-বাবাদের মানসিক দুঃখ, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, বেকার সমস্যা, বিভিন্ন মহামারি, বন্যা ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে এই পটগুলি পরিবেশন করে থাকেন।

তবে পটসংগীত শুরু করার পূর্বে দর্শকদের সামনে হাজির করতে পটের শুরুতে 'টেলার পট' (ছেলে ভোলানো নানা মজাদার চিত্র) দেখিয়ে থাকেন। পট প্রস্তুত প্রণালীটি অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ এবং নিপুণ হস্তের কারুকার্যের ব্যবহার লক্ষিত হতে দেখা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে সাদা আর্ট পেপারে রং ও তুলি দিয়ে বিভিন্ন চিত্র এঁকে থাকেন। বিভিন্ন রঙের ব্যবহার ও উৎপাদন লোকজ রীতিতে হয়ে থাকে। রঙের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহৃত হয়। যেমন—হলুদ গুঁড়ো, জামের রস, চালতার বীজ, গিরিমাটি, পাকা পুঁইফল ও রস, ভুসাকালি প্রভৃতি। এইভাবে হলুদ, নীল, সবুজ, লাল, বেগুনী ইত্যাদি রং প্রস্তুত হয়। পেনসিল বা স্কেচে চিত্র আঁকার পর তা রং দিয়ে ভরাট করা হয়। এক্ষেত্রে বেল বা ময়দার আঠা তুঁতে মিশ্রিত করে প্রলেপ দেওয়া হয়, তাতে কাপড় বসানো হয়। এরপর সেগুলি রৌদ্রে শুকানো হয়। দুই প্রান্তে দুটি বাঁশ বা কাঠের গোলাকার দণ্ড প্রবেশ করিয়ে রোল করে রাখা হয়। কিছুক্ষেত্রে কাপড়ের উপর এলামাটি বা গোবরের প্রলেপ লাগিয়ে তার উপর পটচিত্রগুলি আঁকা হয়। সেগুলিতে পরে দীর্ঘস্থায়ীত্ব দান করা হয়।

এই গেল মোটামুটি পট নির্মাণ কাহিনি। এইভাবে এত কষ্ট করে পট অঙ্কনের মধ্য দিয়ে বাংলার লোককাহিনির ধারাকে বজায় রেখে নিজস্ব ভঙ্গিতে পটসংগীত পরিবেশিত করে থাকে। সামাজিক সংস্কারের মূল স্রোতকে বজায় রাখেন। এত কষ্টের মধ্যেও তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটেনি, দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। এ প্রসঙ্গে ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের মতটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে—

> পটুয়া সম্প্রদায়টি হিন্দু-মুসলমান মিশ্র সংস্কৃতির বাহন হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করেছে। কেউ আবার বলে থাকেন বল্লাল সেনই চিত্রকরদের মুসলমান বানিয়েছেন। জন্মের ইতিহাস যেমন-ই হোক, পটুয়ারা যে লোক-শিক্ষক-শিল্পী এবং গায়ক তাতে কোন সংশয় নেই।[১]

পটুয়ারা পটচিত্রগুলি প্রস্তুতের পর সুর সহযোগে এগুলি গেয়ে থাকেন। তাই তারা শুধু সংগীত স্রষ্টাই নন, একইসঙ্গে গায়ক ও সুরকার। এই সংগীত মূলত আখ্যানমূলক গীতি। এই পটের গানগুলি লোকসমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পটের চিত্রে বাঙ্ময় ও পটুয়ার সংগীতে দর্শক-শ্রোতা মনমুগ্ধ হয়ে ওঠে। তারা আপ্লুত হন, একইসঙ্গে লোকশিক্ষাও জন্মায়। সংগীতের সুর খুবই উচ্চাঙ্গের ও স্বরের হয়ে থাকে। সংগীতের সহ অনুষঙ্গ হিসেবে বাঁশি ও ডুগডুগির বাদ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যা দর্শক-শ্রোতা মনকে আকর্ষিত করে।

পটশিল্পীদের মতোই পটসংগীত নানা শ্রেণিতে বিভক্ত। তবে সব চিত্রই মূলত সংগীত সহযোগে লোকসমক্ষে তুলে ধরা হয়। ধর্মীয় বিষয় অবলম্বন করে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক পটের সংখ্যাই সর্বাধিক জনপ্রিয়। পটসংগীত সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বলেছেন—

> বাংলার অধ্যাত্ম জীবনে সর্বাপেক্ষা গভীর স্তরের ভাবধারা ও রসধারা এই পটগীতিতে রূপায়ণ লাভ করেছে... সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় ও ছন্দে। ইহা কোনো অভিজাত সমাজের ভাব বিলাস ব্যঞ্জক সাহিত্য নয়, জাতির সাধারণ প্রাণ যে অনাবিল ও বিলাস কলুষহীন ভাবধারার জীবন্ত

প্রবাহে ভরপুর ছিল, তাহার এবং বাঙ্গালী হিন্দুর গভীর অন্তশ্চরিত্রের ও ধর্ম বিশ্বাসের রসপূর্ণ অথচ সহজ স্বাভাবিক ও সরলতা মাখা রূপায়ণ।[২]

৩ ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু পটসংগীত এর নিদর্শন তুলে ধরছি—

১. গোরুর পট : আরে গরু নারো গরু চারো গরু বড় ধন।/আবার যারে ঘরে গরু নাই মা... ওগো মা বৃথা এ জীবন/আর শনি মঙ্গল বারে দিনে যে জন ওগো মা গোবর ও বিলায়/আবার তাহার ঘরে লক্ষ্মী ছেড়ে, ওগো মা অন্য ঘরে যায়/আর শনি মঙ্গলবারে দিনে যে জন ওগো মা মাছ পোড়া খায়/বছরে বছরে গোরুর পাল নষ্ট হয়।[৩]

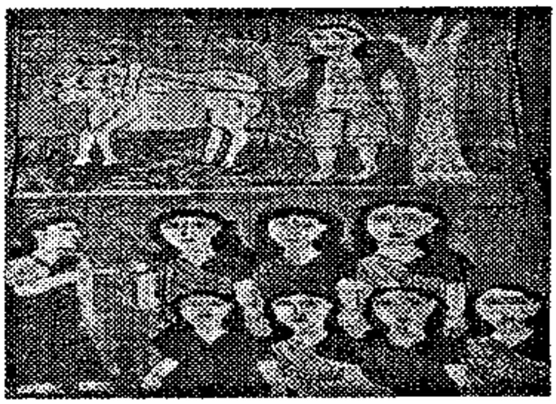

গৃহস্থ ব্যক্তিবর্গদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিধি, নিয়ম ও পালন এবং অর্থনৈতিক ও খাদ্যের চাহিদা মেটাতে গোরু পালন অন্যতম পেশা ছিল। তাই সেই গোরুর যথাযথ প্রতিপালন ও রক্ষণা-বেক্ষণ করা উচিত যা একান্নবর্তী পরিবারের সমস্ত বউরা সম্পাদন করেন। সেই নির্দেশ শ্বশুরমশাই বা বাড়ির কর্তারা দিতেন। আর এই কাজ যথার্থ সম্পাদিত না হলে যে কি ভয়ংকর পরিণতি নেমে আসতে পারে সেই বিপদসূচক দিকগুলি এই পটসংগীতে উদ্ভাসিত হতে শোনা যায়।

২. যমপট : ননী ওগো মা চুরি করে খাই/আর মস্ত সাঁড়াশি করে জিহ্বা টেনে লেয়/আর ভাণ্ডারির চাল যে জন ভুল করে খায়/মস্তকেতে নিয়ে যেয়ে ঢেকিতে পার দেয়/নিজের পতি থাকতে যে জন পরের কাছে যায়/তাকে খরখরে খেজুর গাছে তুলে, তাহার ওগো মা অতি সাজা দেয়/আর হীরামণি বেশ্যা মাগো, অন্নদান-বস্ত্রদান সোনা দান করেছিল/তাই তাকে সোনার পুষ্পরথে স্বর্গে নিয়ে গেল/তাই, এক কটি চাল দেবেন মা, এক খোড়া মুড়ি/খেয়ে দেয়ে নাম করবো বীরভূমের দাঁড়কা আমার বাড়ি॥[৪]

এই গানে মানুষের অপকর্মের ফলশ্রুতি ধরা পড়ে। উক্ত সংগীতটিতে আমরা দেখি, চুরি করে খাওয়ার অপরাধে যমদূত মস্ত সাঁড়াশি নিয়ে জিহ্বা টেনে নেয়। তাছাড়াও নিজের পতি বা স্বামী থাকতেও পরপুরুষে আসক্ত হয় ও গমন করে তাদের শাস্তিস্বরূপ ধারালো খেজুর গাছে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও দেখি অসৎকর্মের পরিবর্তে যদি ভালো কাজ করা যায় তাহলে তার পরিণতি শুভ বা মঙ্গলময় হয়। যেমন—হীরামণি একজন বেশ্যা হলেও তিনি প্রচুর দান-ধ্যান করেছিলেন তাই তাকে যমদূতেরা পুষ্পরূপ স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিল। এই পটসংগীতের ভণিতা অংশে পটুয়ার বাড়ি ও গ্রামের কথা জানা যায়।

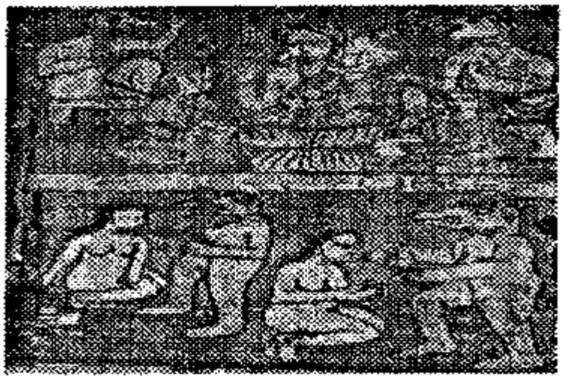

৩. চৈতন্যবিষয়ক পট সংগীত : ষোড়শ শতাব্দী মূলত বাংলা সাহিত্যে 'সুবর্ণযুগ'। এই শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে বাংলাসাহিত্যে ভক্তিরসের প্লাবন দেখা দিয়েছিল। বাংলার পটসংগীতে তাঁর প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলার পটশিল্পীগণ তাঁর জীবনকে অবলম্বন করে নানা ধরনের পটসংগীত রচনা করেছেন। এগুলিকে মূলত চৈতন্য বিষয়ক পটসংগীত বলা হয়। এর মধ্যে আছে 'মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ', 'বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার ক্রন্দন', 'নিমাইয়ের বাল্যজীবন'—এই সকল বিষয় নিয়ে পটচিত্র ও পটসংগীতগুলি জনমানসে আজও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। এমন একটি পট সংগীত হলো—

> নবদ্বীপের মাঝে ছিলেন জগাই আর মাধাই,/হরি ব'লে বাহু তুলে নাচে দুই ভাই।/নবদ্বীপ মাঝে ছিলেন শচী মাতা রানি;/তাঁহার গর্ভে জন্ম নিলেন নিমাই গুণমণি।... হেলেদুলে সোনার নিমাই বাড়িতে লাগিল/দিনক্ষণ দেখে নিমাইকে পাঠশালাতে দিল;/সব ছেলের পড়া হইল নিমাইয়ের নাহি হইল,/রাগ ক'রে পণ্ডিতমশাই নিমাইকে মারিল।/কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাই তমালতলে গেল,/ষড়ভুজ মূর্তিখানি নিমাই পণ্ডিতকে দেখাইল।/গলায় বস্ত্র দিয়ে পণ্ডিত কহিছে বচন.../অপরাধ ক্ষমা করো ওগো শচীর নন্দন/রামরূপে ধনুধারী, কৃষ্ণ রূপে বাঁশি,/গৌরাঙ্গ রূপেতে নিমাই সেজেছেন সন্ন্যাসী।[৫]

উক্ত পটসংগীতটিতে নিমাই বা চৈতন্যদেবের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। তিনি নবদ্বীপে শচীমাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ঘিরে সকলেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ক্রমে নিমাইকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পণ্ডিতের কাছে পাঠানো হয়। পণ্ডিত নিমাইকে পড়া না করার জন্য প্রহার করেন। পরে পণ্ডিত চৈতন্যের স্বরূপ জেনে গলবস্ত্র হয়ে চৈতন্যের কাছে ক্ষমা চান। আসলে চৈতন্যদেব ছিলেন রাম বা কৃষ্ণের অবতার এক মহাপুরুষ। সেই সুর এই পটসংগীতের মধ্যে ধ্বনিত হতে শোনা যায়।

এই পটশিল্প শুধুমাত্র বাংলার উল্লেখযোগ্য লোকশিল্পই নয়, একইসঙ্গে দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে সারা বিশ্বে এর জনপ্রিয়তা লক্ষিত হতে দেখা গেছে। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে আদান-প্রদানের মাধ্যমে সুষ্ঠ সংস্কৃতিকে বজায় রাখা সেই বাস্তব সত্যকেই পটশিল্প ও সংগীতের মাধ্যমে তুলে ধরে। এই পটুয়া সম্প্রদায়গণ নানা ধর্মীয়, পৌরাণিক বিষয়কে অবলম্বন করে ছবি এঁকে ও গান শুনিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সামান্য কিছু উপার্জন করেন মাত্র। পটুয়াদের জীবনাচরণ এক মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয়বাহী; তারা না হিন্দু, না মুসলমান। মূলত নীতি, সংস্কার, নান্দনিক বিকাশ সমস্ত উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে পটশিল্প ও পটুয়াসংগীত সাংস্কৃতিক ও সমন্বয় ভাবনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। আবহমান কাল ধরে এই শিল্প বা

সংস্কৃতি মানবহৃদয়ে চিরন্তনত্বের দাবি রাখে। তবে উপযুক্ত সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার কারণে এই শিল্প ক্রমশ বিলুপ্তির পথকে প্রশস্ত করে তুলেছে। তাই সময় এসেছে বিষয়টি নিয়ে ভাববার ও সেদিকে হস্তক্ষেপ করবার—এই আশাবাদ পটুয়াদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শোনা যায় বারংবার।

উৎসের সন্ধানে

১. আদিত্য মুখোপাধ্যায় : 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', "পট ও পটুয়া", অমর ভারতী, ২০০৫, পৃ. ৯৭

২. গুরুসদয় দত্ত : 'পটুয়া সঙ্গীত', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৯৩, পৃ. ১৮

৩. সাক্ষাৎকার : হয়রান পটুয়া, লিঙ্গ—পুরুষ, বয়স—৫০, গ্রাম—দাঁড়কা, থানা—লাভপুর, জেলা—বীরভূম, তথ্যসংগ্রহের তারিখ ২৯ জুন, ২০২০

৪. সাক্ষাৎকার : হয়রান পটুয়া, লিঙ্গ—পুরুষ, বয়স—৫০, গ্রাম—দাঁড়কা, থানা—লাভপুর, জেলা—বীরভূম, তথ্যসংগ্রহের তারিখ—২৯ জুন, ২০২০

৫. সাক্ষাৎকার : মিঠু পটুয়া, লিঙ্গ—পুরুষ, বয়স—৪০, গ্রাম—দাঁড়কা, থানা—লাভপুর, জেলা—বীরভূম, তথ্যসংগ্রহের তারিখ—১২ জুলাই, ২০২০

তথ্যের সন্ধানে

১. সেখ একরামুল হোসেন : 'ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি', লোকভারতী পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ৩০ নভেম্বর, ২০১৯

২. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', দে বুক স্টোর, ২০১৬

৩. আদিত্য মুখোপাধ্যায় : 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', অমর ভারতী, ২০০৫

৪. পল্লব সেনগুপ্ত : 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা

৫. চিত্তরঞ্জন মাইতি : 'পট, পটুয়া ও পটুয়া সংগীত', সাহিত্যলোক, জুন, ২০০১